

ড. মো. শরিফ উদ্দিন

## মানসম্মত শিক্ষাই হোক অঙ্গীকার

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজির মেয়াদ শেষ হয়েছে গত বছর। বিশ্বনেতারা একসঙ্গে বসে আন্তর্জাতিক আলোচনা করেছেন, কাক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত না হলেও যতটুকু অগ্রগতি তা আশা জুগিয়েছে নেতাদের। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭টি ধারা সংবলিত একগুচ্ছ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার সময়সীমা ধরা হয়েছে ২০৩০ সাল। আর এ নতুন লক্ষ্যমাত্রাটি মূলত এমডিজিরই বর্ধিত সংস্করণ। ইউএনডিপিড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা ইউএনডিপিড কর্তারা খেটেখুটে, পৃথিবী ঘুরে, নানা সমীক্ষা ও যাচাই-বাছাই শেষে এ লক্ষ্যমাত্রা সাজিয়েছেন, যাকে আমরা বলছি এসডিজি বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা।

এ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চার নম্বর ধারাটি হল অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমতাপূর্ণ, মানসম্মত শিক্ষা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি। বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থাৎ এমডিজিতে শুধু সংখ্যার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল, যেমন বিদ্যালয়ে ভর্তির হার, পাসের হার ইত্যাদি। অন্যদিকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমান সুযোগের মানসম্মত শিক্ষার কথা। জীবনব্যাপী শিক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে, অর্থাৎ প্রথাগত শিক্ষা শেষ হয়ে গেলেও যেন শিক্ষার দ্বার বন্ধ হয়ে না যায়। সারা জীবনের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করা গেলে সত্যিকার অর্থেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। তবে এর আগে কিছু পূর্বশর্ত তো রয়েছেই। একটি দেশের জনগোষ্ঠীকে ক্ষুধা-দারিদ্রের মধ্যে রেখে নিচুই এ জীবনব্যাপী কিংবা মানসম্মত শিক্ষার বন্দোবস্ত সম্ভব নয়।

এখনও প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ ক্ষুধা-দারিদ্রের সঙ্গে নিত্যদিন লড়াই করছে। সাম্প্রতিক সময়ে হয়তো গড় মাথাপিছু আয় কিছুটা বেড়েছে; কিন্তু সেই আয় নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সব মানুষের ক্ষেত্রে এখনও সমান নয়, তার চেয়েও দুঃখজনক বিষয় হল, অদূর ভবিষ্যতে সমান হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখতে পাই না। প্রান্তিক পর্যায় থেকে শুরু করে শহরের অসংখ্য বস্তিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু এখনও বিদ্যালয়ে নাম লেখাতে পারে না, সরকারি হিসাবে যত সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে নাম লেখায়, তাদের মধ্যে এখনও ২১ শতাংশ শিশু প্রাথমিকের পাঠ শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। মানুষের মুখে আহার নেই, শরীরে পুষ্টিহীনতা ও রোগ-শোক, চিকিৎসা ব্যয়বহুল ও ঝামেলাপূর্ণ, বস্তিগুলোতে লাক্ষ্য পরিবারের বসবাস, অথচ নেই বিদ্যুৎ পানি ও স্যানিটেশনের মতো মৌলিক ব্যবস্থাও।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সব সূচকে এ দুরবস্থা বজায় রেখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন। একটি পরিবারের পার ক্যাপিটাল ইনকাম ও চাহিদার ফারাক হিসাব করলেই আমাদের সমাজের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের করুণ চেহারাটা প্রকাশ পায়। তুলনামূলক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সূচকের অবস্থা যখন তলানিতে, প্রথাগত পড়ালেখার যে ভিত্তি প্রাথমিক পর্যায় সেই প্রাথমিকেরই যখন করুণ অবস্থা, তখন কোথায় রয়েছে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা, তা সহজেই অনুমেয়।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে গেলে কিছু কাজ পূর্বশর্ত হিসেবে সমাধা করতে হয়। ধরা যাক, একটি নির্দিষ্ট জনপদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির হার কম, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সেখানে দারিদ্রের মাত্রা প্রকট, তাদের ক্ষুধার যন্ত্রণা মেটাতেই অনেক সময় ব্যয় করতে হয়, নয়তো পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে অন্ন সংস্থানে যেতে হয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা হাওর অঞ্চলের কথা বলতে পারি। সেখানকার শিশুরা বর্ষাকালে তুলনামূলক বেশি বিদ্যালয়বিমুখ থাকে। এমনিতেই তো যাতায়াতে সমস্যা, তার ওপর ঘরে খাদ্য সংকট, এহেন পরিস্থিতিতে তাদের নেমে পড়তে হয় মাছ ধরার কাজে। অতএব ক্ষুধার সমস্যা সমাধান না করা গেলে শিক্ষায় কাক্ষিত অগ্রগতি অসম্ভব।

অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ওই নির্দিষ্ট জনপদের অবকাঠামোগত উন্নয়নও কম জরুরি নয়। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থাই যেন বেশি অবহেলার শিকার হচ্ছে, অথচ

প্রাথমিক শিক্ষার শক্তিবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি জরুরি। অবহেলাপূর্ণ, পরিত্যক্ত কিংবা প্রায় পরিত্যক্ত বিদ্যালয়ে শিশুদের কাক্ষিত বিকাশ আশা করা যায় না। প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য বিশেষ বাজেট বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার মানবৃদ্ধিতে আপাতত সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতেই হবে।

শিক্ষাকে মানসম্মত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধি। মূল প্রবৃদ্ধির অস্তত ছয় শতাংশ না হলে শিক্ষার সুফল ঘরে আনা কষ্টসাধ্য কাজ। আমরা শিক্ষার জন্য উচ্ছ্রিত অশ্রুটুকু রেখে দিয়ে ভালো ফল আশা করব এটি নিঃসন্দেহে বোকার স্বর্গে বসবাসের শামিল। ব্যক্তি উদ্যোগে শিক্ষার নীপশিখা কিছুটা শানিত হতে পারে, কারণ ব্যক্তি মিলে সমাজ ও দেশ; কিন্তু এখানে মোটা দাগে সরকারি সহযোগিতা, প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষার মান পরিচর্যা সরকার যদি আগ্রহ না দেখায়, তাহলে ‘পরয়া যার শিক্ষা তার’ নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, শিক্ষা হয়ে উঠবে বাগিজের বড় হুতিয়ার। অন্যদিকে এ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী শিক্ষার সুফল থেকে বাইরে ছিটকে পড়বে। কারণ তাদের হাতে তো অটেল পরয়া নেই।

শিক্ষার এ ভয়াবহ বাগিজিকীকরণ ঠেকাতে শিক্ষা খাতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বাড়তে হবে। অথচ আমরা দেখছি দিন দিন শিক্ষায় আগ্রহ কমছে সরকারের। শিক্ষার বাজেট ও

প্রাথমিক শিক্ষার মান যদি আমরা

নিশ্চিত করতে না পারি তবে

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, শিক্ষার

পরবর্তী ধাপগুলোর মান সংরক্ষণ

করাও কঠিন হবে। যতই সহস্রাব্দ

উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মেয়াদ শেষ হয়ে

যাক, যতই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

নতুন করে নির্ধারিত হোক না কেন,

ইতিবাচক উদ্যোগ না নিলে আমাদের

শিক্ষার মান সংরক্ষণ সহজ হবে না।

মানসম্মত শিক্ষাই হোক আগামী

প্রজন্মের জন্য আমাদের অঙ্গীকার।

আনুষঙ্গিক সহায়তা বৃদ্ধির বদলে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বনির্ভর করার কথা বলা হচ্ছে, শিক্ষার বাজেটকে আরও দশটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো কোনো বাগিজিক প্রতিষ্ঠান নয় যে, তাকে ব্যবসা করে মুনাফা লাভ করতে হবে, মুনাফা অর্জিত না হলে পরের বছর তালা বুলিয়ে দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে শিক্ষার জন্য, গবেষণার জন্য, নিত্যনতুন জ্ঞান সন্ধানের জন্য।

শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এগুলো কোনো কঠিন বিষয় নয়, প্রয়োজন আন্তরিকতার পরিচয় দেয়া। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা নেই, শিক্ষক নেই, শিক্ষক থাকলেও তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খবর আরও খারাপ, কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষার ন্যূনতম মানদণ্ড রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। কারণটা খুবই সহজ—অনেক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতনের ব্যবস্থা নেই, তবু তারা যা করছেন তাকে অনেকটা নিজের খেয়ে বনের মোষ

তাড়ানোর গল্পের মতো। সরকারি ও অন্যান্য কলেজ, যেখানে অনার্স ডিগ্রি দেয়া হয়, সেখানে কিছুদিন আগেও সেশনজটের পাহাড় ছিল, পাস করে বের হতে হতে আট থেকে নয় বছর লেগে যেত, সেখানে ইদানীং ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু হয়েছে, বেশিরভাগ কলেজে ক্লাস-পরীক্ষার কোনো খোঁজ নেই, অথচ সাত থেকে আট মাস কোনোভাবে গেলেই এখন শুরু হয় বার্ষিক পরীক্ষা। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তেলসমাদির খবর সবাই পত্রপত্রিকার বদৌলতে কম-বেশি জানি। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-গবেষণার মন্থরগতি, অন্যদিকে হাতেগোনা কয়েকটি বাদে বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে সার্টিফিকেট বাগিজ। এসব সমস্যা মোকাবেলায় একদিকে যেমন দ্রুত শিক্ষায় প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে, অন্যদিকে অনিয়ম মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকেই। নয়তো মানসম্মত শিক্ষা সুদূরপর্যন্ত থেকে যাবে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাও কোনো কাজে আসার কথা নয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি আমাদের বেশি মানোপীড়ার জন্ম দেয়। এখানে শিক্ষার যে বন্দোবস্ত দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে তার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, একজন শিক্ষকই সব বিষয় পাঠ দিচ্ছেন, বাংলা, গণিত থেকে ইংরেজি, বিশেষায়িত শিক্ষক নেই সেখানে, তার ওপর নিত্যনতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের হিড়িক, দফায় দফায় সিলেবাস পরিবর্তন তো আছেই। যেমন, কয়েক বছর আগে সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি নামে যে পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে তার কার্যকারিতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে বিশেষ কোনো কথাবার্তা নেই। জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিটি শিক্ষকদের নাগালের বাইরেই রয়ে গেল এতদিন ধরে। শিক্ষকদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করার তৎপরতার কোনো খবর এখনও আমাদের কাছে নেই, শিক্ষকরা নিজেদের বিচার-বুদ্ধি, মেধা এবং বাজারে প্রচলিত নোটবই অনুসরণ করে শিশুদের জন্য পাঠ তৈরি করছেন। ইংরেজি ও আগের তুলনায় মূল বইবিমুখ হয়ে ঝুঁকিছে নোটবইয়ের দিকে। অথচ সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের পাঠ্যবইবিমুখ করা। এখন শিক্ষকদের একটি বড় অংশও নোটবইবিমুখ। এ হল প্রাথমিক শিক্ষার দুর্দশার একটি দিক, আরও বহু হতাশার চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

একথা ঠিক, বিগত বছরগুলোর তুলনায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার বেড়েছে; কিন্তু শিক্ষার মান যে বাড়ছে না একথা মানতে হবে। যাদের পরয়া আছে তারা সন্তানদের বিভিন্ন নামি-নামি বেসরকারি বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন, নিজের সন্তানের জন্য নিশ্চিত করছেন মানসম্মত শিক্ষা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যে প্রশ্নের উত্তরে নয় সে কথাও আমাদের মাথায় রাখা উচিত। কিন্তু আমরা কিছুতেই সেই বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা ভুলে যেতে পারি না, যারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ নেয়। তাদের জন্য অবশ্যই মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কর্তাব্যক্তির গুণু বড় বড় কথা বলেই খালাস, তারা জাতির সামনে বছরে একবার বই বিতরণ করেন; ঘোষণা করেন, এবার ভর্তির হার যে কোনো বছরের তুলনায় বেশি; কিংবা বলেন, এবার বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী পাস করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হাজার হাজার বিদ্যালয় যে প্রধান শিক্ষকবহীন কীভাবে দিনের পর দিন চলছে সে খবর তারা আমাদের জানান না।

প্রাথমিক শিক্ষার মান যদি আমরা নিশ্চিত করতে না পারি তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, শিক্ষার পরবর্তী ধাপগুলোর মান সংরক্ষণ করাও কঠিন হবে। যতই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মেয়াদ শেষ হয়ে যাক, যতই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নতুন করে নির্ধারিত হোক না কেন, ইতিবাচক উদ্যোগ না নিলে আমাদের শিক্ষার মান সংরক্ষণ সহজ হবে না। মানসম্মত শিক্ষাই হোক আগামী প্রজন্মের জন্য আমাদের অঙ্গীকার।

ড. মো. শরিফ উদ্দিন : অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, গণিত বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; প্রেসিডেন্ট, রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপিউট এডুকেশন